গৃহপরিচারিকাদের জীবন কথা

বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়

গত কয়েক দশকে মানবাধিকার আন্দোলনের প্রভাবে বিশ্বের নারীমুক্তির আন্দোলনে যে জোয়ার এসেছে, তার অভিঘাতে আমাদের দেশের মেয়েদের জীবিকার প্রশ্নটি সোচ্চার। এখানকার বিশাল শ্রমবাহিনীকে ব্যবহার করার মত কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ এখনও সৃষ্টি হয়নি। বলাই বাহুল্য যে এই শ্রমবাহিনীর এক বৃহৎ অংশ হল মেয়েরা। অতীতে সংগঠিত শিল্পগুলিতে যে সব মেয়েরা যুক্ত ছিল, স্বাধীনতার ত্রিশ বছরের মধ্যে সেই মেয়েরা বিতাড়িত হয়েছে— তাদের সরে যেতে হয়েছে অসংগঠিত কর্মক্ষেত্রে অথবা বেকার জীবনে। শুধু শিল্প থেকেই নয়, কৃষি থেকেও তাদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

১৯৮৭ সালে ছয় সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় কমিশন স্বনির্ভর কাজে এবং অসংগঠিত সংস্থায় যুক্ত মেয়েদের উপর একটি সমীক্ষা করে। এরই প্রেক্ষিতে শ্রীমতী লোভাটের নেতৃত্বে যে রিপোর্টটি 'শ্রমশক্তি' নামে প্রকাশিত হয়, সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, অসংগঠিত কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা প্রধানত সবচেয়ে কঠিন, অনিয়মিত, বৈচিত্রহীন অধিক সময় সাপেক্ষ এবং কম পারিশ্রমিকের কাজ করে। নতুন প্রযুক্তি বা যন্ত্রপাতি আমদানিতে তাদের বিশেষ কোন লাভ হয়নি। আধুনিকীকরণের ফলে তাদের কাজে কোন বৈচিত্র্য আসেনি। কৃষিতে যন্ত্রপাতি আমদানির ফলে তারা কৃষক থেকে ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়েছে। মেয়েদের এখন একটি মজুত শ্রমবাহিনী হিসেবে ব্যবহার করা হয়, প্রয়োজনে তাদের বাইরেও ঠেলে দেওয়া হয়। স্থায়িত্ব এবং নিরাপত্তার অভাবে তারা বাধ্য হয় যেন তেন প্রকারের কাজে যুক্ত হতে। মেয়েদের কাজ সম্বন্ধে আমাদের সমাজে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন এখনও হয়নি। নারীশ্রমিক সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশনেও এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত। বাস্তবে কর্মরতা মেয়েদের যে সংখ্যা, তার থেকে প্রায় ত্রিশ শতাংশ কম হারে তথ্যে দেখানো হয় এবং বিনা বেতনে পারিবারিক শ্রম, ব্যক্তিগত উৎপাদন ও গৃহস্থালী কাজের মূল্যায়ন হয় না। দরিদ্র পরিবারের উপার্জনে মেয়েদের অবদান অর্থনৈতিক বাজারের হিসেবের একেবারে বাইরে। বর্তমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে গৃহকাজে যুক্ত মেয়েদের উপরে ঘরে ও বাইরে কাজের বোঝা অত্যন্ত অমানবিক। গৃহস্থ বাড়িতে শ্রম দেওয়ার পর ঘরে ফিরে তাদের সেই একই কাজ করতে হয় পরিবারের সদস্য হিসাবে। অসংগঠিত কর্মক্ষেত্রের মধ্যে রুজি-রোজগারের জন্য গৃহস্থলি কাজে যুক্ত মেয়েদের সংখ্যা সম্বন্ধে কোন সার্বিক তথ্য পাওয়া যায় না। গৃহকর্মে মজুরির বিনিময়ে যুক্ত মেয়েদের নিয়ে যে বিশাল শ্রমবাহিনী, তার সংখ্যাগত তথ্য জনগণনায় বা আদমসুমারিতে নথিভুক্ত করা নেই। এই পেশায় যুক্ত মেয়েদের 'গৃহপরিচারিকা', 'রাঁধুনি' বা 'ঝি' বলা হয়। এদের উপার্জন যেহেতু অনিয়মিত এবং হিসাবের বাইরে, তাই জাতীয় আয়ে এদের অবদানের কোন উল্লেখই থাকে না। জাতীয় কমিশনের রিপোর্টেও গৃহকর্মে যুক্ত মেয়েদের সম্বন্ধে কোন তথ্য লিপিবদ্ধ হয়নি। অথচ গৃহকর্মে যুক্ত মেয়েদের এই পেশা নতুন নয়— অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই পেশা প্রচলিত। গৃহপরিচারক, চাকর বা ভৃত্য হিসাবে একসময় পুরুষদের নিয়োগ করা হত। বিশেষত ধনী জমিদার শ্রেণীর বাড়িতে পুরুষ পরিচারকদের নিয়ে আনেক কাহিনীও আছে। কিন্তু ত্রিশ চল্লিশ দশকের সময় থেকেই গৃহকর্মে নিযুক্ত পুরুষদের সংখ্যা দ্রুতহারে কমে গিয়েছে— বর্তমানে প্রায় নেই বললেই চলে। গৃহকর্মের পেশাটি সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের দখলেই চলে এসেছে। দারিদ্র, শিক্ষার অভাব ছাড়াও এর অন্যতম কারণ হল এই যে মেয়েরা বাল্যকাল থেকেই গৃহস্থালী কাজে যুক্ত থাকে এবং এই কাজে অভ্যস্ত ও দক্ষ হয়ে ওঠে। এর জন্য পৃথকভাবে কোন প্রশিক্ষণ নিতে হয় না। পরিবারের অস্তিত্বের সঙ্গে গৃহকর্মের শ্রম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই এই কাজের চাহিদা এবং যোগান— দুই-ই সমান। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী অসংখ্য পরিবার এই পেশার উপর নির্ভরশীল। এই সব পরিবারের সিংহভাগ সাংসারিক ব্যয় মেয়েরা বহন করে। এমন একটি প্রচলিত ও প্রয়োজনীয় পেশায় যুক্ত শ্রমজীবী মেয়েদের সংখ্যাগত কোন তথ্য কেন পাওয়া যায় না, কেনই বা আদমসুমারিতে তার তথ্য থাকে না, তা বোধগম্য হয় না। গৃহকর্মে নিযুক্ত শ্রমজীবী মহিলাদের বিষয়টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। এদের শ্রম প্রচলিত অন্যান্য শ্রমশক্তির সঙ্গে যুক্ত করা হলে দেখা যাবে যে শ্রমজীবী মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়—বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি।

গৃহশ্রমে যুক্ত পরিচারিকাদের ক্ষেত্রে আর একটি নেতিবাচক দিক হচ্ছে এই যে, তাদের শ্রমের কোন মর্যাদা (dignity of labour) নেই। এদের কাজকে সমাজে অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ বলে মনে করা হয়। কোন পরিবারে কন্যাসন্তান যদি লেখাপড়ায় মন না দেয় বা কোন সৃজনশীল কাজে অনীহা প্রকাশ করে, তাহলে তাকে ভৎর্সনা করা হয়—'যা, ঝি-গিরি করে খা।' আবার কোন ঝগড়া - বিবাদের সময় বলা হয়— 'ঝি-চাকরের মত চিল্লাচ্ছিস কেন?' পোশাক-আশাক ময়লা হলে বলা হয়—'ঝি-চাকরের মত পোশাকের চেহারা করেছে দেখ।'। গৃহকর্মে নিযুক্ত মেয়েদের সম্বন্ধে এতটা নিম্নমানের দৃষ্টিভঙ্গী যে প্রায়শই বলতে শোনা যায়— 'ওরা তো ঝি-চাকর শ্রেণীর লোক— ওদের সঙ্গে এত কথার কি দরকার?' এদের জন্য জামা-কাপড় কিনতে গেলে দোকানে জিজ্ঞাসা করতে দেখেছি— 'ঝিদের জন্য শাড়ী দেখান তো?' বর্তমানে অবশ্য 'ঝিদের জন্য' ভাষাটি পাল্টে' কাজে মেয়েদের জন্য' শাড়ী দেখাতে বলা হয়। মনিব বাড়িতে এদের উচ্চাসনে বসতে নেই। অনেক বাড়িতে এদের খাবারও আলাদা করে নির্দিষ্ট করা থাকে।

বাড়িতে 'কাজের মেয়ে' বা গৃহপরিচারিকাদের সঙ্গে আরো একটি অত্যন্ত অমানবিক আচরণ হল যে কোন জিনিস হারিয়ে গেলে বা চুরি গেলে প্রথমেই এদের দায়ী করা হয়। প্রকৃত চুরির দায়ে ধরা পড়বে ঘটনা যেমন আছে, তারও চেয়ে বেশি দেকা যায় নিছক সন্দেহের বশে কাজের মেয়েদের 'চোর' বদনাম দিয়ে কাজ থেকে বিতাড়ন, অত্যাচার ও পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনা। এদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে জেনেও কর্মদাতারা ক্ষমা চাওয়া তো দূরস্থান, অনুশোচনার চিহ্নও তাদের মধ্যে কমই দেখা যায়।

কাজের ধরণ ঃ

পরিচারিকাদের কাজের বিভিন্ন ধরন বা নমুনা আছে। এক শ্রেণীর কাজে মেয়েরা 'ঠিকে' কাজ বা 'ঠিকে ঝি' এর কাজে যুক্ত বলা হয়। এরা একাধিক বাড়িতে কাজ করে। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোথাও দুইবেলা, কোথাও একবেলা, কোথাও বা ঘন্টা হিসাবে এরা কাজ করে। এদের মধ্যে 'ঝি' এবং 'রাঁধুনি'— দুইই আছে। একাধিক বাড়িতে রান্নার কাজ করে যারা তাদের বলা হয় 'ঠিকে রাঁধুনি'। কোন বাড়িতে একবেলা, কোন বাড়িতে দুইবেলা রান্নার কাজ করে এরা। 'ঠিকে ঝি' ও 'ঠিকে

রাঁধুনি'- দের মধ্যে মজুরির পার্থক্য থাকে। রান্নার কাজে মজুরি একটু বেশি— সর্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত রাঁধুনিদের মজুরি ছাড়াও খাওয়া - পরার সুযোগ থাকে। গত দু-তিন দশকে সাধারণভাবে 'কাজের লোক' - দের অবস্থার ও অবস্থানের কিছু পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই তবে সেই পরিবর্তন আইনের পথে ঘটেনি— মালিক ও কর্মীর মধ্যে কিছুটা সমাজ-চেতনা ও মানবিক চেতনা বৃদ্ধির ফলেই এই পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তনের ইতিবাচক রূপটি অনেক সময়ই নির্ভর করে শ্রমিক - মালিক সম্পর্কে মানবিক আচরণের তারতম্যতার উপর। সামাজিকভাবে অধিকারের প্রশ্নে কাজের মেয়েদের সুযোগ - সুবিধা আদায়ের জন্য তেমন কোন দরকষাকষির জায়গা এখনও তৈরি হয়নি— অর্থাৎ গৃহকর্মে নিযুক্ত শ্রমজীবী মেয়েদের নিজস্ব কোন সংস্থা না থাকায় তারা দরাদরি ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। তবে যে সকল অঞ্চলে চাহিদার তুলনায় যোগান কম, সেখানে কাজের মেয়েদের দরাদরি ক্ষমতা অধিক লক্ষ্য করা যায়।

কাজের পরিধি, সময় এবং পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী মজুরি পরিমান মাসে ১০০০ টাকা থেকে ২৫০০ হাজার টাকা। কে কতটা বেশি মজুরি সংগ্রহ করতে পারবে, তা নির্ভর করে কে কতটা কায়িক শ্রম ব্যয় করতে সক্ষম, তার উপর। ঠিকে কাজ যারা করে, তাদের এক বৃহৎ অংশ গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে কাজ করতে আসে। লোকাল ট্রেন ধরে ভোরবেলায় তারা শহরে চলে আসে ফিরে যায় সন্ধ্যার আগে। প্রতিদিন ট্রেনে যাতায়াত করে যারা কলকাতায় কাজ করতে আসে, তাদের অধিকাংশই উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বাসিন্দা। মেদিনীপুর থেকে অনেক মেয়ে কলকাতায় বস্তি অঞ্চলে ঘর ভাড়া করে পরিচারিকার কাজ করে। যারা সর্বক্ষণের কাজে যুক্ত, তারা মনিবের বাড়িতেই থাকে নতুবা শহরের বস্তি অঞ্চলে থাকে।

প্রতিদিন ট্রেনে যাতায়াত করে কাজে আসা মেয়েদের গ্রামে নিজস্ব আস্তানা আছে। আবার উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়েদের অনেকেই রেল লাইনের পাশে ছোট ছোট খুপরি বা ঝুপরি বেঁধে থাকে, এদের অনেকেরই দেশে সামান্য জমিজমা ও বাস্তুভিটা আছে। সেখানে আত্মীয় বা পরিচিত বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার উপর ঘরবাড়ি দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে এরা কলকাতায় বস্তি অঞ্চলে বা রেললাইনের পাশে ঘর বাঁধে। মাঝে মাঝে এরা দেশের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ খবর নেয়, যার সামান্য চাষবাস আছে, সে ফসল সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। রেল লাইনের ধারে ঝুপড়িবাসীদের প্রায়শই উৎখাতের নোটিশ দেওয়া হয়, আস্তানাগুলি ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তখন এরা রেললাইন অবরোধ করে প্রতিবাদ জানায়। এদের জীবনযাপনের এই টানাপোড়েন সর্বদা চলতেই থাকে। বস্তি বা রেললাইনের ধারে এদের অস্থায়ী বাসস্থানের চেহারা অতি করুণ। একটি পরিবারের একটিই করে খুপরি, তার ভিতরে ইঁটের উপর ইঁট চাপিয়ে এরা চৌকি বসায়। চৌকির নিচে সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্র থাকে। রান্নার জন্য আলাদা কোন জায়গা থাকে না, ঘরেরই এককোণে কেরোসিন - স্টোভে রান্না হয়। কেউ কেউ ওরই মধ্যে বাঁশ দিয়ে মাচা তৈরি করে মাথা গোঁজার জন্য আর একটি বাড়তি জায়গা করে নেয়। অধিকাংশ বাসিন্দারই ঘরে বিদ্যুৎ নেই। কেউ কেউ রাস্তার লাইন থেকে বেআইনীভাবে বিদ্যুতের তার টেনে নেয়।

যারা গ্রামে থেকে প্রতিদিন যাতায়াত করে, তাদের অবস্থা অত্যন্ত কঠিন। অনেকটা পায়ে চলা পথ অতিক্রম করে ভোর না হতেই এদের ট্রেন ধরতে হয়। আবার সারাদিন কাজ সেরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হয় ঘরে ফেরার ট্রেন ধরতে। দল বেঁধে কাজ করতে আসা এই মেয়েরা নিজেদের মধ্যে সারাদিনের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে। নতুন নতুন কাজের খোঁজ খবর পাওয়া যায় কথোপকথনের মাধ্যমে। এরা কাজ সেরে যখন ঘরে ফেরার ট্রেনে ওঠে, তখন মুড়ি জাতীয় খাবারের পসরা নিয়ে হকাররাও ট্রেনে ওঠে। ক্ষুধার্ত মেয়েরা প্রায় সকলেই মুড়ি খেতে খেতে সুখ-দুঃখের আলোচনা করে, মনিব বাড়ির কোন বিশেষ মুখরোচক ঘটনা নিয়ে হাসাহাসি করে। বিভিন্ন সময়ে সমীক্ষার কাজ করতে ট্রেনে যাতায়াতের পথে এই দৃশ্য আমার চোখে পড়েছে।

গৃহকর্মের ক্ষেত্রগুলিতে কিছু পরিবর্তন ঃ

পরিচারিকাদের কাজের জগতে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। শহরের বিস্তার ও উন্নয়নের সুবাদে তাদের কাজের পরিধি অনেকটাই বিস্তার লাভ করেছে। সমাজে জনসংখ্যার একাংশের হাতে প্রচুর সম্পদ মজুত হওয়ায় শতকরা দশ-বারো ভাগ মানুষের জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, বড় বড় বহুতলবিশিষ্ট ফ্ল্যাটবাড়ি বা কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ চলেছে ঢালাওভাবে। তার ফলে একই জায়গায় একজনের একাধিক কাজ পাবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় ঠিকে এবং সর্বক্ষণের কাজের লোকের চাহিদা বেড়েছে।

দ্বিতীয়, বহুতলবিশিষ্ট ফ্ল্যাটবাড়ির মালিকদের বাড়ির কাজ অর্থাৎ গৃহকর্মের সুবিধার্থে আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির আমদানির ফলে কাজের মেয়েদের কায়িক পরিশ্রম কিছুটা লাঘব হয়েছে এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রশিক্ষণ এরা রপ্ত করেছে।

তৃতীয়তঃ এদের মজুরিও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মনিব এবং কর্মীর মধ্যে বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই এই মজুরি বৃদ্ধির বিষয়টি সম্ভবপর হয়েছে। পরিচারিকাদের কাজের স্থায়িত্ব বা নিরাপত্তার অভাব অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে কারণ কাজের চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়েছে। যৌথ পরিবার ভেঙে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য অনু পরিবারের। এই ছোট পরিবারের অনেক স্বামী - স্ত্রী উভয়েই চাকুরিজীবী হওয়ার 'কাজের লোক' অর্থাৎ গৃহপরিচারিকার চাহিদা বেড়েছে। একই কমপ্লেক্সে একাধিক মেয়ে কাজ করার ফলে তাদের নিজেদের মধ্যে অনেকক্ষেত্রেই একটি অলিখিত বোঝাপড়া বা চুক্তি গড়ে উঠেছে। অনেক সময় এরা এককভাবে বা দলবদ্ধ হয়ে মজুরিবৃদ্ধি এবং তাদের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। চাকুরীজীবী পরিবারগুলি কাজের লোকদের উপর নির্ভরশীল হওয়ার ফলে বেতন বা মজুরি নিয়ে দর কষাকষির সুযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে।

গৃহপরিচারিকার কাজে যুক্ত মেয়েদের বিষয়ে অনেক পরিবারেই মানবিক আচরণ পরিলক্ষিত হয়। কাজে কামাই করলে বকাবকি করা হলেও সাধারণত মাইনে কাটা হয় না। জামাকাপড় নিম্নমানের দেওয়া হয় না। বিপদে - আপদে অনেক 'মনিব - বাড়ি' তাদের সাহায্য করে থাকে। কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে। বিশেষত মধ্যবিত্ত অনেক পরিবারে এখনও 'কাজের লোক'দের মজুরি, কাজের পরিধি ইত্যাদি বিষয়ে কৃপণতা ও বৈষম্যমূলক আচরণ পরিলক্ষিত হয়। যথাসম্ভব কম মজুরির বিনিময়ে অধিক কাজ আদায় করার প্রবণতা পরিবারগুলির মধ্যে দেখা যায়। এই ধরনের পরিবারগুলিতে একজন বেশিদিন টিকে থাকে না, অনবরত 'কাজের লোক' বদলে যেতে থাকে।

গত দুই-তিন দশক ধরে গৃহকর্মে নিযুক্ত অল্পবয়সী মেয়েদের সংখ্যা বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক পরিবারই নাবালিকা নিয়োগে উৎসাহী। কারণ তাদের কম মজুরি দেওয়া যায়, তারা কম খায় এবং তাদের হুকুম দিয়ে বা মিষ্টি কথা বলে অনেক বাড়তি কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। এই অল্পবয়সী মেয়েদের মধ্যে মালিকদের বাড়ির মহিলাদের আচার - আচরণও

সাজসজ্জা অনুকরণ করার প্রবণতা দেখা যায়। এদের একটি বড় অংশই সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে নিযুক্ত হয়। আজকাল প্রত্যেক বাড়িতেই টেলিভিশন থাকার ফলে হিন্দি গান, নাচ ও বিজ্ঞাপনের প্রলুব্ধ প্রচার এই মেয়েদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এরা নানা ধরনের প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করার ও চলতি ফ্যাশান অনুকরণ করার চেষ্টা করে। লেখাপড়া করার ইচ্ছে এদের মধ্যে কমই থাকে এবং অধিকাংশ মালিক বা মনিবই সেই দিকটিতে নজর দেয় না। প্রলোভনের হাতছানিতে এই মেয়েরা নানা ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। তাদের এই বিপর্যয়ের খবর সংবাদ - মাধ্যম সূত্রে প্রায়ই পাওয়া যায়। আরো ভাল উপার্জন, বিয়ের প্রলোভনে পা দিয়ে বহু নাবালিকা অন্ধকার জগতে হারিয়ে যায়।

কিন্তু গৃহপরিচারিকা হিসাবে নিযুক্ত মায়েরা, তাদের সন্তানদের লেখাপড়া শেখাতেই ক্রমেই আগ্রহী হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য, পুত্রসন্তানদেরই এ বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। অনেকে কন্যাসন্তানদের স্কুলে ভর্ত্তি করালেও বেশিদিন মেয়েদের ঘরে রাখে না, ১৩/১৪ বছর বয়স হলেই বিয়ে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ধার দেনা করে পাত্রপক্ষের চাহিদা মিটিয়ে তাড়াতাড়ি মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয় এরা।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত অধিকাংশ পরিবারই ঠিকে ঝি পছন্দ করে কারণ এদের কম মজুরি দেওযা যায়, অল্প সময়ের মধ্যে মোটামুটি শ্রমসাপেক্ষ কাজগুলি করিয়ে নেওয়া যায়, খেতে-পরতে বা আশ্রয় দিতে হয় না। 'ঠিকে ঝি' -রাও কোন একটি বাড়িতে সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে থাকতে চায় না। কারণ, একটি বাড়িতে আটকে না থেকে যদি একাধিক বাড়িতে কাজ করে তাহলে চার-পাঁচটি বাড়ির বেতন বা মজুরি মিলিয়ে এককালীন অনেক নগদ টাকা হাতে আসে। আবার সব বাড়ির থেকে অল্প অল্প করে যা খাবার জোটে, তাতে তার নিজের ছাড়াও বাড়ি ছোটদের জন্য বাড়তি খাবার হয় যায়। সকাল পাঁচটা থেকে বেলা এগারোটা এবং বেলা তিনটে থেকে সন্ধ্যা ছটা - সাতটা পর্যন্ত এরা বিভিন্ন বাড়িতে কাজ করে। দুপুরবেলা যে দুই-তিন ঘন্টা অবসর মেলে, তখন প্রয়োজনবোধে বাড়তি রোজগারের জন্য ঘরে বসে ঠোঙা তৈরি, ব্লাউজে হেম সেলাই ও বোতাম লাগানো, প্লাস্টিকের পুতুলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জোড়া লাগানো ইত্যাদি ছোট খাটো ফুরনের কাজ করতে পারে এরা। একাধিক বাড়িতে দ্রুত কাজ সারার জন্য বিবাহিতা ও বয়স্কা মহিলারা তাদের অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যায় সাহায্যকারী হিসেবে এবং তাদের নয়-দশ বয়স থেকেই 'ঠিকে ঝি' এর কাজ বা সর্বক্ষণের 'খাওয়া পরার কাজ' -এ লাগিয়ে দেওয়া হয়।

এদের কয়েকজনের জীবন কথা ঃ

করুনার মা বেহুলা একজন 'ঠিকে ঝি'। বাড়ি ক্যানিং -এ, যেটুকু জমিজমা ছিল, বিক্রি হতে হতে বর্তমানে বাস্তুভিটাটুকু ছাড়া আর কিছুই নেই। বৃদ্ধা শাশুড়ীকে বাড়ি পাহারায় রেখে স্বামী-স্ত্রী কলকাতায় চলে এসেছে তিরিশ বছর আগে। একটি বস্তিতে এরা ঘর ভাড়া নিয়েছে। স্বামী বাজারের কাছে ফুটপাতে নারকেল ও সবজি বিক্রি করে। করুণারা ১২টি ভাইবোনের মধ্যে বেঁচে আছে সাতজন। তিন বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। এক বোন স্বামীর অত্যাচারে পালিয়ে এসেছে বাবা-মায়ের কাছে। সে-ও ৩/৪টি বাড়িতে ঠিকে কাজ করে। করুণারা চার বোনই ঠিকে কাজের সঙ্গে যুক্ত। সকলে মিলে ১৫/১৬টি বাড়িতে ঠিকে হিসেবে কাজ নিয়ে একটু একটু করে গাঁয়ে জমি কিনে ভাগ চাষ করাচ্ছে। সারা বছরের জামাকাপড় ঐ ১৫/১৬ টি বাড়ি থেকেই এরা পেয়ে যায়। কোন বাড়ি থেকে কত দামের জামাকাপড় দেওয়া হবে, তা জেনে নিয়ে অনেক সময় করুণার জামাকাপড় না নিয়ে নগদ টাকা সংগ্রহ করে নিজেদের প্রয়োজন মত জামাকাপড় কেনে এবং টাকা থেকে কিছু সঞ্চয়ও করে।

আমি করুণাকে আমার বাড়িতে থাকা - খাওয়ার কাজে অর্থাৎ সর্বক্ষণের জন্য আলাদাভাবে নিয়োগ করেছিলাম। মেয়েটি বুদ্ধিমতীও ছিল। লেখাপড়া করতে ইচ্ছুক ছিল সে। বইপত্র কিনে তাকে পড়াতে গিয়েছিল দেখলাম যে কোন পড়াই একেবারের বেশি বলার বা বোঝাবার দরকার হচ্ছে না। মুখে মুখে বড় বড় সংখ্যার যোগ - বিয়োগ করে ফেলত। অক্ষর পরিচয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর যোগ্য হিসেবে পৌঁছাতে তার একবছরও লাগেনি। আশ্চর্য মেধা ছিল ওর! আমার যেসব বিদেশী বন্ধু - বান্ধব মাঝে মাঝে আমার বাড়িতে কিছুদিন থেকে যেতেন, তাঁরা ওর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। ইংরেজীতে ছোট ছোট গল্পের বই এনে দিতেন তাঁরা। মুহূর্তের মধ্যে করুনা সেইসব শিখে পড়ে নিতে পারত। ওর মাকে বললাম যে করুণাকে যদি ৪/৫ বছরের জন্য আমাদের হেপাজতে রাখা হয় তাহলে আমরা লেখাপড়া শিখিয়ে ওকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ করে দেব। একথা শুনে করুণার মা মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়ার জন্য গোপনে বিয়ের সম্বন্ধ করে করুণাকে আমার বাড়ির কাজ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দেশের বাড়িতে চলে যায় এবং সেখানে মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফিরে আসে। এরকম করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় করুণার মা জানায় যে, ওদের ঘরের মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিয়ে হবে না অথচ মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে। করুণার বয়স তখন ১৪ বছর। আমি জানতাম যে করুণার হাতটান ছিল, আমার বাড়ি থেকে অনেক জিনিস সরিয়ে ও বিক্রি করে দিত তবুও ওর শুধুমাত্র বুদ্ধি ও মেধা দেখে চেয়েছিলাম ওর লেখাপড়ার সুযোগ করে দিতে।

শিবানী সর্দার ঢাকুরিয়ার একটি ফ্ল্যাটবাড়িতে চারটি পরিবারের এবং সেলিমপুরে দুইটি বাড়িতে ঠিকে ঝি ও রাঁধুনির কাজ করছে ১৬ বছর ধরে। দেশের বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জয়নগরে। ১৫ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। দেশের বাড়িতে বাস্তুভিটা ছাড়া সে সামান্য ধান জমি আছে, তাতে সংসার চলে না। দেশের বাড়ির শ্বশুর- শ্বাশুড়ীকে রেখে তিনটি সন্তান ও স্বামীকে নিয়ে সে কলকাতায় চলে আসে রোজগারের আশায়। ঢাকুরিয়া রেলস্টেশন সংলগ্ন লাইনের ধার ঘেঁষে যে খুপরি বা আস্তানা গড়ে উঠেছে, তারই একটিতে থাকে ওরা। খুপরির মধ্যে বাঁশের মাচা করে তিনতলা করা হয়েছে স্থান - সংকুলানের জন্য। তার তক্তপোষকে ইঁটের সাহায্যে উঁচু করে একতলা - দেতলা করা হয়েছে। খাটের নিচে ঘর - সংসারের জিনিস আর ঘরের এককোণে কেরোসিন স্টোভে রান্নার ব্যবস্থা। শিবানীর স্বামী অত্যন্ত অসল প্রকৃতির। ঘরে তার দাপটে সবাই অস্থির। শিবানী তাকে অত্যন্ত সমীহ করে এবং তার কথামতো সব কাজ করে। শিবানী চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। তার স্বামী নিরক্ষর হলেও দেখতে সুন্দর বলে তাকে নিয়ে শিবানীর দারুণ গর্ব। সকাল ছটা থেকে রাত্রি আটটা বর্যন্ত শিবানী ছয়টি বাড়িতে কাজ করে মাসে উপার্জন করে ২০০০ টাকা। কাজের বাড়িগুলি কাছাকাছি হওয়ার সুবাদে কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিজের সংসারের কাজগুলিও সেরে নেয়। কাজের বাড়িগুলি থেকে জলখাবার পায়, সব কাজের ফাঁকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে স্বামী ও সন্তানদের খাওয়ায়। এভাবে গত ত্রিশ বছর ধরে সংসার চালাচ্ছে শিবানী। নিজের রোজগার থেকে সঞ্চয় করে এবং কিছুটা ধার করে সে বড় মেয়েটার বিয়ে দিয়েছে ইলেকট্রিসিটির সারাই কাজ করে এমন একটি ছেলের সঙ্গে। মেয়ের বিয়ের ধার শোধ করতে শিবানীকে আর ২/৩ টি খুচরো কাজ নিতে হয়েছে।

ঢাকুরিয়ার একটি ফ্ল্যাটে ১৯৯৫ সালে শিবানীর সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয়, তখন ওর ছোট মেয়ে দোলনের

বয়স ১৬ বছর। শিবানী ছেলে ও মেয়েকে স্কুলে ভর্ত্তি করেছিল। ছেলেটি দুইবার নবম শ্রেমীতে পাশ করতে না পেরে পড়া ছেড়ে দেয় এবং একটি ওষুধের দোকানে সামান্য কাজে যোগ দেয়। সঙ্গদোষে কিছুটা বিপথগামী হয়ে ১৯ বছর পূর্ণ না হতেই একটি ১৪/১৫ বয়সী মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে তোলে। বিয়ের ৬/৭ মাস পরই তাদের একটি সন্তান জন্মায়। ছোট মেয়ে দোলনকে চেষ্টা করেও পঞ্চম শ্রেণীর বেশী পড়াতে পারে না শিবানী। কারণ লেখাপড়ায় একেবারেই মন নেই তার। শিবানী তাই দোলনকে আমার বাড়িতে খাওয়া পরার কাজে লাগল। ফাঁক পেলেই টি.ভি.-র সামনে বসে পড়ত দোলন। মাইনের টাকা থেকে প্রসাধনী কিনত তার মাকে না জানিয়ে। পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে আড্ডাও জমাত সে এইসব দেখেশুনে শিবানী মেয়ের বিয়ের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। মেয়ে ১৭ বছর পা দিলে বিয়ের সন্ধান প্রায় পাকা করে আমার কাছে শিবানী সাহায্য চাইতে আসে। আমি এই বিয়েতে তীব্র আপত্তি জানাই এবং ১৮ বছর বয়স না হওয়া পর্য়ন্ত মেয়ের বিয়ে দিলে পুলিশে দেওয়া হবে বলে ভয় দেখাই। তখনকার মত শিবানী পিছিয়ে গেলেও মেয়ে ১৮ বছর পা দিতেই তার বিয়ে ঠিক করে ফেলে একজন অটো-চালকের সঙ্গে। আমি তখনও আপত্তি জানালে শিবানী জবাব দেয় যে, তাদের গ্রামে গঞ্জে ১২/১৩ বছরের মেয়েদের হরদম বিয়ে হয়ে যায় অথচ পুলিশ কারোকেই ধরে না। শিবানী মেয়ের বিয়ের সপক্ষে এই যুক্তি দেখায় যে যখন মেয়ের লেখাপড়ায় মন নেই, টি.ভি তে হিন্দি ছবি দেখে দেখে মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে, বাজে ছেলেদের পাল্লায় পড়েছে। তখন উঠে - পড়ে মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেলাই উচিত।

দোলনের বিয়েতে শিবানীকে বরপণ দিতে হয়েছে নগদ ১০ হাজার টাকা। এছাড়া মেয়ের গলা, কান ও হাতের গয়না, বরের আংটি, বাসনপত্র ইত্যাদি মিলিয়ে মোট ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে শিবানীর। নিজের সঞ্চয়, আত্মীয় স্বজনের সাহায্য ছাড়াও ২০ হাজার টাকা ধার করতে হয়েছে তাকে। কাজের বাড়িগুলি থেকে এই টাকা ধার নিয়েছে সে। তাই প্রত্যেক বাড়িতে অর্ধেক মাইনে নিয়ে টাকা শোধ করতে অনেকদিন লেগেছে। এছাড়াও সুদের বিনিময়ে সে যে ঋণ করেছিল, সেই টাকা শোধ হওয়া দূরস্থান, সুদের টাকা গুনতে হচ্ছে এখনও। প্রবল আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন শিবানী না খেয়েও নিয়মিত দেনা শোধ করতে বদ্ধপরিকর।

দিবারাত্রি কঠিন পরিশ্রম করেও শিবানী তার মুখের হাসি বজায় রেখেছে। কি করে সে সংসার চালাবে, সেই ভাবনায় আমরা অস্থির ও কিন্তু নির্বিকার। তার বক্তব্য, মাথার ওপরে ভগবান আছে— বড় মেয়েকেও তো সে এইভাবেই বিয়ে দিয়েছে। তাতে সে যখন মরে যায়নি, এবারও মরবে না।

আসলে এই পরিস্থিতিতে আমি নিজে খুব অসহায় বোধ করতাম। নাবালিকার বিয়েটা হয়তো আমি আটকাতে পেরেছি কিন্তু পণপ্রথার বিরুদ্ধে তো কোন প্রতিবাদই করতে পারলাম না। দোলনের যৌতুকের খরচ তো কিছুটা আমরাও বহন করলাম। যৌতুক দেওয়া - নেওয়া যে আইনত অপরাধ, সেকথা জেনেও কিছু বলতে পারলাম না। শিবানীকেও দোষ দিতে পারি না। মধ্যবিত্ত মানসিকতায় শিবানীর মত কন্যাদায়গ্রস্ত মায়েরা সাধ্যের বাইরে গিয়ে লোক নিমন্ত্রণ করে খাওয়াচ্ছে কারণ পাছে লোকে কিছু বলে। খেটে-খাওয়া মানুষদের মধ্যে এই ধরনের ভাবনা কিন্তু আগের চেয়ে এখন আরও প্রবল হয়েছে।

বর্তমানে শিবানীর শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে। সংসার যাতে আর না বাড়ে, তার জন্য নিজের বড় মেয়ে ও পুত্রবধূর দুইটি সন্তান হওয়ার পর তাদের জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ছেলের সংসার সে আলাদা করে দিয়েছে। এখন একটি ফ্ল্যাটের চারটি পরিবারে রান্না ও ঠিকে কাজ করে শিবানী। ওদের মাথার উপরে উচ্ছেদের খাঁড়া ঝুলছে। গত ১০/১২ বছর ধরে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়ছে ওরা কিন্তু এবার বোধ হয় উচ্ছেদ আর ঠেকানো যাবে না। শিবানীর দেশে ফিরে যেতে আপত্তি নেই কিন্তু ওর ভাবনা হল, দেশে যেহেতু ফ্ল্যাট বাড়ি নেই তাই ওর কাজ করে খাওয়ার সম্ভাবনাও আর থাকবে না।

সল্টলেকের কোন একটি সচ্ছল পরিবারে তাপসী খাওয়া-পরার কাজে যুক্ত হয় ১৩/১৪ বছর বয়সে। ছোটখাটো চেহারা তাপসীর, দেখতেও সুন্দর— স্বামী স্ত্রীর ছোট্ট সংসারে, তাপসী ভালই ছিল। তাঁদের কোন সন্তান না থাকায় তাঁরা ওকে খুবই আদর যত্নে রেখেছিলেন। তাপসীর মা বিমলাও যাদবপুরের সেন্ট্রাল পার্কের এক অধ্যাপকের বাড়িতে থাকা ও সর্বক্ষণের জন্য অর্থাৎ খাওয়া - পরার কাজ করত। তাপসীর ছোট বোন মালতী ওদের বাবার সঙ্গে দেশের বাড়িতে থাকত, মাসে মাসে এসে স্ত্রী ও মেয়ের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে নিয়ে যেত।

কাজের বাড়ি থেকে তাপসী মাসে ৫০০ টাকা পেত। ওর যাবতীয় শখ ও চাহিদা মনিবেরাই মেটাতেন। বিশেষত বাড়ির কর্তাটি তাপসীর উপরে এতই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল যে গিন্নির মতামতকে উপেক্ষা করে তাপসীর মতকেই প্রাধান্য দেওয়া হত। তার ফলে কর্তাগিন্নির মদ্যে দাম্পত্য অসন্তোষ দানা বাঁধে এবং কর্তার এই পক্ষপাতিত্বের সুযোগ নিয়ে তাপসীও। থাকার জন্য আলাদা ঘর, আসবাব পত্র, প্রসাধনের দ্রব্যসামগ্রীই শুধু সে পায়নি, টেলিভিশন সেটিও ছিল তার ঘরে।

হটাৎই একদিন খব এল যে, তাপসী আত্মহত্যা করতে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাপসীর মা সাহায্যের জন্য আমাদের শরণাপন্ন হলে আমরা কয়েকজন হাসপাতালে ওকে দেখতে যাই। আমাদের কিন্তু ওর কাছে যেতে দেওয়া হয় না। আত্মহত্যার কারণ জানতে চাইলে বাড়ির কর্তা জানায় যে, সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শ্রীদেবীর নৃত্যানুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য তাপসী দামী টিকিট সংগ্রহ করার আবদার জানিয়েছিল বাড়ির কর্তাকে। তার আবদার রক্ষা করা হয়নি বলে সে বেগন খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। তাপসীর মা বিমলার সে কথা বিশ্বাস হয়নি। বিমলার কথা শুনে আমাদেরও মনে হয়েছে যে এর পিছনে কোন রহস্য আছে। পুলিশ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মী হিসেবে বাড়ির কর্তাটি আত্মহত্যার যাবতীয় প্রমাণ বিলোপ করে ফেলে। মেয়েটি মৃত্যুর আগে তার মাকে কিছু বলতে চাইলে তাকে বলতে দেওয়া হয় না। মেয়েটি মারা যাওয়ার পর বিমলা আমাদের সঙ্গে থানায় গিয়ে যে বিবৃতি দেয়, আমাদের অনুপস্থিতিতে তাকে বদলে অন্য বিবৃতি কবুল করায় থানার আধিকারিক। পরে বিমলাকে চেপে ধরায় ও কেঁদে জানায় যে, তাপসীর মালিকের কথামত থানায় বিবৃতি দিলে ওরা বিমলাকে অনেক টাকা দেবে বলেছে এবং ছোট মেয়ে মালতীর বিয়ের সব ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। তাপসীর দেহ পোস্টমর্টেমও করা হয়নি। তার মৃতদেহ বাড়ির লোকদের হাতে না দিয়ে তাড়াতাড়ি দাহ করা হয়। বলাই বাহুল্য, শেষ পর্যন্ত বিমলা একটি পয়সাও তাদের কাছ থেকে পায়নি।

যুদ্ধের সময় ১৯৭১ সালে মাত্র ১৪/১৫ বছর বয়সে বাংলাদেশ থেকে এই দেশে পালিয়ে এসেছিল অন্নপূর্ণা। বাবা -মা ও আত্মীয় - স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যদের সঙ্গে পাড়ি দিয়েছিল প্রাণ বাঁচাতে। কিছুদিন শিয়ালদহ স্টেশন এবং

বিভিন্ন রিলিফ ক্যাম্পে কাটিয়ে অবশেষে মানিকতলা অঞ্চলের একটি পরিবারের খাওয়া - পরা ও মাসিক ২০-২৫ টাকা মাইনেতে বহাল হয় সে। ঐ পরিবারের গিন্নি সংসারের সব কাজের ভার তার ওপর চাপিয়ে ইচ্ছেমত এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত। বাড়ির কর্তা স্ত্রীর অনুপস্থিতির সুযোগে অন্নপূর্ণার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করত। প্রথমদিকে অন্নপূর্ণা ভয়ে, সঙ্কোচে আপত্তি জানালে লোকটি চাকরি খোয়ার ভয় দেখাত। কিন্তু অচিরেই সে কর্তার ঐ ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং ঐ সম্পর্ক সে উপভোগও করে। লোকটি গোপনে ওকে বাড়তি টাকা দিত, সৌখিন জিনিসপত্রও কিনে দিত। এভাবেই চলতে থাকে এবং একসময় অন্নপূর্ণা সন্তানসম্ভবা হয়। সন্তান নষ্ট করে দেবার জন্য কর্তা গোপনে টোটকা ওষুধ প্রয়োগ করে। তাতে হিতে বিপরীত হয়। পেটের অসহ্য যন্ত্রণায় অন্নপূর্ণা জ্ঞান হারায়। জ্ঞান ফেরে হাসপাতালে। দশ - বারোদিন হাসপাতালে ছিল সে। এই সময় কেউ তার খোঁজ নেয় না। নার্স -এর কাছ থেকে সে জানতে পারে যে গর্ভপাত করানোর চেষ্টায় তার এই অবস্থা। মনিব বাড়ি থেকে কেউ এসেছিল কিনা জানতে চাওয়ায় নার্স জানায় যে একজন লোক তাকে ভর্তি করে টাকাপয়সা জমা দিয়ে বলে গেছে যে সুস্থ হয়ে যে যেন নিজের পথ নিজেই দেখে নেয়, মনিব বাড়িতে যেন না যায়। অন্নপূর্ণার মাথায় যেন বাজ পড়ে। তার 'দাদাবাবু' যে এমন ব্যবহার করতে পারে, সে যেন বিশ্বাসই করতে পারে না। নার্স কিন্তু ইঙ্গিতে জানায় যে পাড়ার মস্তানদের সঙ্গে ঢলাঢলি করেই তার এই অবস্থা। নার্সের রূঢ় ব্যবহার, তাকে ছুটি দিয়ে রুক্ষভাবে হাসপাতাল ছেড়ে চলে যেতে বলা, এ সবকিছুই অন্নপূর্ণার চরিত্র স্খলনের বিষয়টিই প্রতিষ্ঠিত করে।

ছুটির কাগজ হতে পেয়ে অন্নপূর্ণা কিংকর্তব্যবিমূঢ়! হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে সে? অঝোরে কাঁদতে থাকে সে। এই সময় হাসপাতালেরই আংশিক সময়ে এক আয়া তার সব কথা শুনে তাকে নিয়ে যান মনিব বাড়িতে। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে গিন্নিমার সঙ্গে দেখা হতেই তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। তাকে নেকমহারাম, বেইমান, নির্লজ্জ বলে তিরস্কার করে বলতে থাকে, বিশ্বাস করে ঘরসংসারের দায়িত্ব তিনি অন্নপূর্ণাকে দিয়েছিলেন অথচ সে বিশ্বাস ভঙ্গ করে বাড়িতে গুণ্ডা বদসাম ঢুকিয়ে মজা করেছে। এমনও হতে পারত যে ঐ সব বাজে লোকেরা তাঁর বাড়ির সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে যেত। অতএব অন্নপূর্ণাকে গিন্নিমা কোনমতেই বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না।

এসব শুনে অন্নপূর্ণার সঙ্গী মহিলাটি তীব্র ভর্ৎসনা করে যখন গিন্নিমাকে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবার ভয় দেখায়, তখন আড়াল থেকে এক পুরুষকণ্ঠ গিন্নিকে নির্দেশ দেয় যে, অন্নপূর্ণার পাওনা টাকা, সঙ্গে আরও দুইমাসের টাকা এবং জিনিসপত্র দিয়ে দিতে। গিন্নি অন্নপূর্ণার টিনের সুটকেশ ও টাকা পয়সা ওর হাতে দিয়ে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেন। অন্নপূর্ণা আবার পথে নামে। তার সঙ্গী মহিলাটি তাকে বিক্সা করে সোজা নিয়ে তোলে নিষিদ্ধপল্লীতে। অন্নপূর্ণা কাঁদতে থাকলে মহিলাটি তাকে বোঝায় যে সে নষ্ট হয়ে গেছে। এই কাজে নেমে পড়া ছাড়া তার আর গতি নেই।

সেই থেকে, অন্নপূর্ণা নিষিদ্ধপল্লীর বস্তির স্থায়ী বাসিন্দা। তার একজন বাঁধা মানুষ আছে, তিনি উকিল। অন্নপূর্ণার যাবতীয় খরচ তিনিই বহন করেন, ঘর ভাড়া করে তিনি তাকে নিয়ে যাবেন, এমন প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

কলকাতায় অসংগঠিত নারী শ্রমিকদের উপর সমীক্ষা চালানোর সময় এই মেয়েটির সঙ্গে আমার দেখা হয়। কিভাবে 'কাজের লাইন' থেকে 'লাইনের কাজ'-এ চলে আসতে সে বাধ্য হয়, সেই কাহিনী তার কাছেই শোনা।

গৃহকর্মে নিযুক্ত মেয়েদের জীবন - যাপন অস্বাচ্ছন্দ্য ও কষ্ট সর্বক্ষণের সঙ্গী। তবুও এই সব শ্রমজীবী মেয়েদের মধ্যেও মাঝে মাঝে ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ দেখতে পাওয়া যায়। তারই এক অনন্য দৃষ্টান্ত **প্রভাবতী।**

কালো গাত্রবর্ণ, পাথরে খোদাই করা চেহারা প্রভাবতীর, হাসিটি মিষ্টি কিন্তু মুখরা বলে বদনাম আছে।

মোট পাঁচটি বাড়িতে ঠিকে কাজ করে সে। ওর কর্মদক্ষতা, পরিশ্রমের ক্ষমতা এবং বিশ্বস্ততা ছিল প্রশ্নাতীত। কিন্তু কেউ ওর মেজাজ ও মুখের ভয়ে কড়া কথা বলতে সাহস পায় না, বরং তোয়াজ করেই চলে। কোনোদিন কাজে আসতে দেরী হলে বা কামাই করলে ওর কাছে কৈফিয়ত চাওয়া চলবে না। ও নিজের থেকেই কারণ বলবে। হুকুমের সুর প্রভাবতী বরদাস্ত করে না। ওর চলাফেরা, আত্মবিশ্বাস, কথা বলার ভঙ্গী আমাদের আকর্ষণ করে, তাই সুযোগমত ওর সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করি। প্রভাবতীর বয়স ৫০ বছর। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বাসন্তী থানার অন্তর্গত ভরতপুর গ্রামে ওর আদি বাড়ি। সেখানে বাস্তুভিটার পাশে একফালি জমিতে সবজি হতো, আর কিছু নারকেল ও সুপুরি। বাড়িতে বাবা - মা, ছোট এক ভাই আর দুই বোন ছিল। ভাইবোনদের মধ্যে প্রভাবতী বড়। বাবা ছিল ভাগচাষী। চাষের মরশুমের বাইরে মাছ ও কাঁকড়া ধরতে যেত পরিবারের সবাই। মেয়েদের বারো মাসের কাজ ছিল ঢেঁকিতে ধান কোটা। এছাড়া চিঁড়ে - মুড়ি কোটা, যাঁতায় ডাল পেষা এ সব কাজই করত গরীব ঘরের মেয়েরা। দুপুরবেলায় খাওয়া - দাওয়ার পরে যে দু - এক ঘন্টা অবসর মিলত, তখন মাদুর বোনা, শীতে গায়ে দেবার জন্য কাঁথা সেলাই ইত্যাদি কাজ করত তারা।

প্রভাবতীদের জীবন এভাবেই কাটছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাজের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এল। হাস্কিং মেশিন বসানোর ফলে গ্রামে গ্রামে ঢেঁকি ও যাঁতার ব্যবহার কমে গিয়ে শূন্যে দাঁড়াল। হাস্কিং মেশিন চালায় পুরুষেরা। ফলে একটি বাঁধা কাজ থেকে মেয়েরা বেকার হয়ে গেল।

প্রভাবতীর মা গ্রাম থেকে চাল সংগ্রহ করে বস্তায় ভরে মাথায় চাপিয়ে শহরে আসত চাল বিক্রি করতে। প্রভাবতীর বাবা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত, তাই কোনরকম কায়িক শ্রমে অক্ষম। ১৪ বছর প্রভাবতী ভাই - বোনদের মধ্যে বড় হওয়ার রান্না, ছোট ভাই - বোনদের দেখাশোনা, রুগীর সেবা সব দায়দায়িত্বই পড়েছিল প্রভাবতীর উপরে। চালের বস্তা বয়ে বয়ে প্রভাবতীর মা শৈলবালার শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়ল। মাঝে মাঝে ট্রেনে পুলিশি হানায় চাল নিয়ে সংকটের সৃষ্টি হত। অবশেষে চাল বিক্রি করার সূত্রে পরিচিত এক মহিলার সাহায্যে শহরে দু-তিনটি কাজের সন্ধান পেয়ে দেশের পাট তুলে দিয়ে বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে বস্তিতে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেয় শৈলবালা। এরই মধ্যে ওর স্বামীর মৃত্যু হয়। গ্রামের পাট তুলে দেবার সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে যায়।

১৬ বছর বয়সে সোনারপুর অঞ্চলের এক ক্ষেতমজুর পরিবারে বিয়ে হয়ে যায় প্রভার। বিয়ের চার বছরের মধ্যে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে জন্মায়। প্রভাবতীর স্বামীর পায়ে একটি পুরানো ক্ষত ছিল, সেই ক্ষত ক্রমে বিষাক্ত হয়ে গেলে তার একটি পা কেটে বাদ দিতে হয়। এর কিছুদিনের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। এই পরিস্থিতিতে প্রভাবতীর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে যৌথ পরিবারের যাবতীয় কায়িক শ্রমের কাজ তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। মুখ বুজে সারাদিন সে কাজ করত। গ্রাম্য কোন জটলায় সে অংশ নিত না, ছেলেমেয়েদের গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করে নানারকম ঠাট্টা - বিদ্রুপের সম্মুখীন হলেও সে গ্রাহ্য করত না।

মেনকি ভাসুর - দেওররা সহানুভূতি দেখাতে এলেও সে আমল দিত না। তার এই হাবভাব পরিবারের লোকেরা পছন্দ করত না। যার সোয়ামি নেই, তার এত দেমাক কিসের— এই ছিল ওদের বক্তব্য।

যুবতী প্রভাবতীকে পুকুরঘাটে বা পথেঘাটে পাড়ার ছেলে - ছোকরারা জ্বালাতন করলেও বাড়াবাড়ি করতে সাহস পেত না।

একদিন গভীর রাতে ছেলেমেয়েদের পাশে যখন সে অঘোর ঘুমোচ্ছে, তখন হঠাৎ তার মনে হয় একটি লোমশ কালো ছায়ার কালো থাবা ওর মুখ চেপে ধরে ওর দেহের ওপর উঠে বসেছে। ক্রমশ সেই চাপ প্রবল হতে প্রভাবতী এক ঝটকায় লোকটাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতেই ছায়াটা হামাগুড়ি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ধড়ফড় করে উঠে বালিশের তলা থেকে দেশলাই বের করে আলো জ্বালাতেই মূর্তিটা উধাও হয়ে যায়। ঘরের বাইরে এসে কাউকে দেখতে না পেয়ে সে হতভম্ব হয়ে যায়, ঘরের মেঝেতে বসে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দেয়। ভোরের আলো ফুটতেই পুকুরে গিয়ে গলা জলে ডুবে বসে থাকে অনেকক্ষণ, তবু শরীর মন ঠাণ্ডা হয় না। ঘরে ফিরে ছেলেমেয়েদের ঘুম থেকে তুলে জামাকাপড় পরিয়ে একটু খাইয়ে নিয়ে সোজা ওদের নিয়ে কলকাতায় মায়ের কাছে আশ্রয় নেয়। আসার আগে শ্বশুরবাড়িতে নিজের ঘরে তালা লাগিয়ে আসে। বাচ্চাদের নিয়ে পরিবারের সকলের সামনে দিয়ে চলে যাওয়ার সময় শ্বশুরবাড়ির সকলে যখন হৈ-চৈ করে ওঠে, দেওর প্রভাকে চলে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তখন ভাসুর কিন্তু তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে যায়। প্রভা তার দেওরকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে সে আর এখানে থাকবে না। কেন সে চলে যাচ্ছে, তা -ও বলবে না। যদি শ্বশুরবাড়ির অংশ থেকে ওর কিছু পাওনা থাকে, তাহলে যেন তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

প্রভার মায়ের শরীর ভেঙে যাচ্ছিল। প্রভা এসে মায়ের কাজগুলো নিজের হাতে তুলে নেয় এবং আরও দু-তিনটে বাড়িতে কাজ ঠিক করে নেয়। ছেলেমেয়েদের কর্পোরেশনের স্কুলে ভর্তি করে দেয়। ছেলেটি স্কুল ফাইনাল পাশ করে একটি কারখানায় কাজ নিয়েছে। মেয়েটি নবম শ্রেণীতে উঠে আর পড়েনি। প্রভা বস্তিতেই নিজস্ব দুইখানা ঘর তুলেছে, পাখা ও টি. ভি. কিনেছে। মেয়ে টি. ভি. দেখে সাজসজ্জার ধরন পাল্টায়, লেখাপড়া করতে চায় না—এ নিয়ে প্রভা দারুণ বিরক্ত।

প্রভা মেয়ের বিয়ের জন্য একটু একটু করে টাকা জমাচ্ছে, শ্বশুরবাড়ির প্রাপ্য অংশ বেচে দিয়ে স্থায়ীভাবে কলকাতার সেলিমপুর অঞ্চলে বাস করছে। যতদিন মেয়ের বিয়ে না হচ্ছে, মেয়ের জন্য একটু অন্য ধরনের কাজের সন্ধান করছে। পরিচারিকার কাজ মেয়েকে সে করতে দেবে না।

প্রভার রোজগার মাসিক ২৫০০ টাকা, ছেলের রোজগার নিয়ে মোটামুটি ভালভাবেই চলে যায় তিনটি প্রাণীর। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে প্রভা। সে অন্যায় সহ্য করে না, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে। কেউ যদি তাকে 'মুখরা' বলে সে জবাব দেয়— ''মুখটা আছে বলেই বেঁচে আছি, নাহলে করে জন্তু - জানোয়াররা ছিঁড়ে খেত।''

সুমিত জানা-র পৈতৃক বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ি মেদিনীপুর জেলার পাশকুড়া অঞ্চলে। সেখানে বসতবাড়িটুকু ছাড়া আর কোন সম্পত্তি নেই। পেটের দায়ে সুমতিরা কলকাতায় এসে গোবিন্দপুর বস্তিতে রেললাইনের কাছে বসবাস করেছে তিরিশ বছর ধরে। ১৫ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল এক রাজমিস্ত্রির সঙ্গে। ১৯ বছর বয়সের চারটি সন্তানের জন্ম দেয়। ১১ বছর ধরে সুমতি পাঁচটি বাড়িতে ঠিকে কাজ করে ২০০০ টাকা মজুরি পায়। স্বামীর কাজ স্থায়ী নয়, মাসে ১৫ দিনই সে বেকার। সুমতির আয়েই প্রধানত সংসার চলে। সুমতির তিন মেয়ে ও এক ছেলের মধ্যে ছেলেটিই বড়—সে বি. কম. পড়ে। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট মেয়ের বয়স ১৫। সে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। মা যখন কাজের বাড়ি যায়, সে তখন ঘর - সংসার দেখে।

সুমতির স্বামী নিজের রোজগারের অধিকাংশ মদের নেশায় ব্যয় করে। একবার সুমতির সঞ্চয়ের ভাঁড় ভেঙে মদ খেয়েছিল। তার শাস্তিস্বরূপ সুমতি বাড়িতে রান্না বন্ধ করে দিয়েছিল— ছেলেকে বলেছিল বাইরে খেয়ে নিতে, মেয়ের খাবার মনিব বাড়ি থেকে নিয়ে আসত। স্বামীকে তখন উপোস করে থাকতে হত। এরপর থেকে স্বামী আর কখনও এমন কাজ করেনি।

উপার্জন বাড়ানোর জন্য সুমতি পাড়ার একটি প্রাইভেট নার্সিং সেন্টার থেকে আয়ার ট্রেনিং নেয়। ছয় মাস ট্রেনিং নিয়ে যে যোধপুর পার্কে একটি স্বচ্ছল পরিবারের এক বৃদ্ধার সেবার কাজ নেয় রাত ৮টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত। একদিন ঐ বাড়িতে ডাকাতরা হানা দেয়। সেই রাতে বাড়িতে কোন পুরুষ মানুষ ছিল না—রুগ্ন বৃদ্ধা, তার পুত্রবধূ ও নাতনিই শুধু ছিল। ডাকাতরা হামলা করলে সুমতি বৃদ্ধা ও তার ছোট্ট নাতনিটিকে নিজের দেহে দিয়ে আগলে রেখে চিৎকার করতে থাকে। ডাকাতেরা পুত্রবধূকে আহত করে সুমিতাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে। বৃদ্ধা ও শিশুটিকে বাঁচাতে গিয়ে সুমিতার হাতের মাংস কেটে হাড় বেরিয়ে পড়ে। সুমিতা এক পাও নড়ে না বৃদ্ধা ও শিশুকে ছেড়ে। পরিবারটিও সুমিতার প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছে। সুমতিকে প্রায় ৩/৪মাস রুবি হাসপাতালে রেখে চিকিৎসার খরচ বহন করেছে ঐ পরিবার। সুমতি মনিব - বাড়ি থেকে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যতদিন সেখানে ছিল, সেই পুরো সময়ের মাস - মাইনে তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঐ সময় তার খুচরো কাজগুলি মেয়ে সামলেছে।

সুমিতির ছেলে বি. কম. পাশ করে একটি প্রাইভেট ফার্মে ছোটখাটো একটি কাজ পেয়েছে। নিজের এবং ছেলের রোজগারের পয়সায় দেশের বাড়িতে ঘর মেরামত করেছে এবং সামান্য জমিও কিনেছে। স্বামীকে তার তত্ত্বাবধানে রেখে দিয়েছে কলকাতায় ছেলে ও মেয়ে নিয়ে সুমতি এরকম ভালই আছে। মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা জমাচ্ছে সে, একটু আধটু করে গয়নাও গড়িয়ে রাখছে একটি ভাল পাত্রের খোঁজও পেয়েছে। যতদিন মেয়ের বিয়ে না হচ্ছে ততদিন নার্সিং সেন্টারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। মেয়ে যাতে কোন অসৎ সঙ্গে না পড়ে, তার জন্য সুমতি সদাসতর্ক।

শুভা ঘোষের নিজেদের বাড়ি মেদিনীপুরে জেলার চুবকা গ্রামে। ৫ কাঠার ওপরে মাটির বসতবাড়ি ওদের। শুভারা দশ ভাইবোন—শুভা সকলের বড়। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে পয়সার অভাবে আর স্কুলে যেতে পারেনি। মা ঘন ঘন সন্তানসম্ভবা হত বলে সাংসারিক কাজের দায়িত্ব সবই ওর ওপরে ছিল। বাবার স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় কায়িক শ্রম করতে পারতো না— চাষের জমি যেটুকু ছিল, তা-ও বেচে দিতে হয়েছে। প্রায় দিনই একবেলা আহার জুটতো। শুভার জ্যাঠা পাশের গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন বলে তবুও কোনওরকমে ঐ অন্নসংস্থান হত।

আমি ঐ গ্রামে কিছু সমীক্ষার কাজে গিয়ে ওদের বাড়িতে একমাস 'পেয়িং গেস্ট' ছিলাম। আমার দেওয়া সামান্য টাকাও ওদের কাছে বড় প্রাপ্তি ছিল। আমি যখন ওদের ওখান থেকে চলে আসি, তখন শুভা কলকাতায় একটি আয়া বা নার্সিং

সেন্টারে প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেবার জন্য আমার কাছে অনুরোধ জানায়। আমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে নামী ও সচ্ছল পরিবারের এক বিধবার সেবার কাজে লাগিয়ে দিই ৬৫০ টাকা মাসিক মাইনেতে। কারণ মাধ্যমিক পাশ না করলে নার্সিং -এর কোন সুযোগ পাওয়া যায় না। সেই মহিলা ওকে নিয়মিত লেখাপড়া ও সেলাই এর কাজ শেখাতেন। শুভাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি ওকে একটি সেলাই মেশিন কিনে দিয়েছিলেন। ঐ মহিলার একটি স্কুল ছিল, সেই স্কুলেও বাচ্চাদের দেখাশোনার দায়িত্বে ছিল শুভরা। সর্বসাকুল্যে ওর মাইনে ছিল ৭৫০ টাকা। পুরো টাকাটাই দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিত সে। ঐ বিধবা মহিলা মারা যাবার পর হিন্দুস্থান পাকে তাঁরই এক আত্মীয়ের বাড়িতে চলে আসে শুভা। সেখানে খাওয়া - পড়া ছাড়া ১০০০ টাকা মাসিক মাইনে পায় সে। তিরিশ বছ ধরে সে সেখানে কাজ করছে, মাঝে মাঝে বাড়ি যায়, টাকা - পয়সা দিয়ে আসে।

তার উপার্জনে সে ছোট ভাইবোনদের মানুষ করেছে, বোনেদের বিয়ে দিয়েছে, ছোট ভাইদের বিয়ে দিয়েছে, ভাইকে গ্রামেই একটি মুদির দোকান করে দিয়েছে এমনকি জমি কিনেছে এবং বাড়িতে গোবরগ্যাস এর সাহায্যে বিদ্যুৎ এনেছে। তার কাজের বাড়ির মালিকদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সকালে ঐ পাড়ারই আর একটি বাড়িতে এক ঘন্টার একটি রান্নার কাজ নিয়েছে মাসে ৫০০ টাকার বিনিময়ে। এভাবেই শুভা নিজের সুখ - সুবিধা বিসর্জন দিয়ে তার পরিবারটিকে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করেছে, পরিবারের সকলকে সাধ্যমত প্রতিষ্ঠিত করেছে। কোন এক সময় নিজস্ব সংসার গড়ে তোলার স্বপ্নও হয়ত দেখেছিল সে কিন্তু ছোট - ভাইবোনদের মুখ চেয়ে সেই স্বপ্নও ত্যাগ করেছে। ওর পরিবারকে সুখে রাখাই ওর জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। এখন ৪৫ বছর বয়সী শুভা দেহে ও মনে ক্লান্ত। কাজের বাড়ির গিন্নিমা অনেকদিন হল পথ - দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। কর্তারও বয়স হয়েছে। শুভাই এখন এ বাড়ির সর্বময় কর্ত্রী। ভবিষ্যৎ নিয়ে সে আর ভাবে না। তার ধারণা এই বয়সে তাকে যে বিয়ে করবে, সে তাকে সেবাদাসী ছাড়া আর কিছুই ভাববে না। তার চেয়ে এই ভাল— এইভাবেই দেশের বাড়ি ও কলকাতার কাজের বাড়ির কর্ত্রী হয়ে থাকা।

বীনা দাসের মামাবাড়ি মেদিনীপুর জেলায় কাঁথিতে। ওর জন্মের পরই বাবা মাকে ছেড়ে চলে যায়, মায়েরও অকালমৃত্যু হয়। মামাবাড়িতে তার উপর অকথ্য নির্যাতন হত। দিদিমা একজন প্রতিবেশীর সাহায্যে কলকাতায় একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে ওকে পরিচারিকার কাজে লাগায়। খাওয়া - পরার কাজ, মাইনে ৫০টাকা। বীণার বয়স তখন ১০/১২ বছর। গায়ের রং কালো বলে ওর মনে খুব দুঃখ। টি. ভি. -র বিজ্ঞাপনের সুবাদে গায়ের রং ফর্সা করার নানা প্রচার ওকে প্রভাবিত করে। শরীরে পুষ্টির অভাব অথচ শরীর - স্বাস্থ্য ভাল করার দিকে ওর নজর নেই। প্রত্যেক মাসে ' ৫০টা রোজগার থেকে একটি করে রং ফর্সা করার ক্রিম কিনে মুখে হাতে মেয়ে আয়নারসামনে দাঁড়ায় আর লক্ষ্য করে কতটা ফর্সা হল। ঘন ঘন আয়নার সামনে দাঁড়ানোর জন্য ঐ বাড়ির লোকজনের কাছে বকুনিও খায় বীনা। তখন নিজে একটি ছোট আয়না কিনে নেয়। রোজ রাতে শোবার আগে লুকিয়ে লুকিয়ে ঐ ক্রীম মাখে আর আয়নায় দেখে গায়ের রং কতটা ফর্সা হল। তাই এই স্বভাবের জন্য কাজের বাড়িতে রাতদিন গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। ও যা কিছু করে, তাতেই সবাই বিরক্ত। একদিন ঐ বাড়ির গিন্নিমার একজোড়া সোনার কানের দুল হারিয়ে যায়। অনেক খোঁজার পর দোষ পড়ে বীণার ওপর। বাড়ির লোক পুলিশের ভয় দেখায়, মার ধোর করে। এর আগেও দু-চারবার বাড়ির ছোটখাটো জিনিস চুরি হয়েছে, বীণার প্রসাধনের জিনিস কোথা থেকে আসে ইত্যাদি সব কিছু মিলে বীণাকে চোর সাব্যস্ত করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এক পরিচিত ব্যক্তির বাড়ি কিছুদিন থাকার পর বীণা অন্য একটি বাড়িতে থাকা - খাওয়ার কাজে খোঁজ পায়। মাসে ২০০ টাকা মাইনেতে সে কাজে বহাল হয়। পঞ্চাননতলার বস্তিতে একটি সান্ধ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুই ঘন্টার জন্য পড়তে যায়। সেখানেই একটি সেলাইয়ের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে কাজ শিখে কাঁথা সেলাইয়ের কাজ করে মজুরি পায় মাসে ২০০ থেকে ৩০০ টাকা। কাজের বাড়ি লোকেরা বীণাকে নানাভাবে সাহায্য করে। ওর নামে পোস্ট অফিসে একটি অ্যাকাউন্টও খুলে দিয়েছে তারা— মাসে মাসে ১০০/২০০ করে টাকা জমায়। কোন কোন মাসে বীণা দেশের বাড়িএত দিদিমাকে টাকা পাঠায়। এখনও কিন্তু নিয়মিত সে রং ফর্সা করার ক্রিম মেখে চলেছে। ওর বিশ্বাস এই ক্রিমে কিছুটা উপকার হবেই— তা না হলে এত প্রচার কেন?

সবিতা সাহা দশ বছর বয়সে বাবা-ম, দাদা-বৌদি ও তাদের একটি তিন বছরের ছেলে সহ পূর্ববাংলা (বর্তমানে বাংলাদেশ) থেকে কলকাতায় এসেছিল উদ্বাস্তু হয়ে। ওরা আশ্রয় পেয়েছিল লেক ক্যাম্পে। সবিতার বাবা পূর্ববঙ্গে সামান্য একজন দর্জি ছিলেন, তার ছোট একটি দোকানও ছিল। সচ্ছলভাবে না হলেও মোটামুটি সংসারটি চলে যেত। কলকাতায় এসে বেশ কিছু দিন পর্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী সাহায্য নিয়ে বেঁচেছিল সবিতার বাবা। স্থানীয় ক্লাবের সদস্যদের সাহায্যে সবিতা বিনা খরচায় ভর্তি হল লেক গালর্স স্কুলে। নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিল সে। বাবা সরকারী সাহায্যে একটি মেশিন সংগ্রহ করে টুকটাক টেলারিং -এর কাজ শুরু করেন—মা দু'তিনটি বাড়িতে গৃহকর্মে নিযুক্ত হয়ে যে রোজগার করত, তা দিয়ে সংসার চলত না। সবিতা বি. এ. পাশ দাদা স্থানীয় ক্লাব সদস্যদের প্রচেষ্টায় একটি সামান্য চাকরি পেলে তখন সংসারে কষ্টেরও কিছুটা লাঘব হল। কিন্তু সবিতার মা পূর্ববঙ্গ থেকে সব কিছু ফেলে চলে আসাটাকে মেনে নিতে পারল না—শরীর ও মন তার ক্রমশ ভেঙে যাচ্ছিল বিশিদিন তিনি বাঁচেননি।

অপূর্ব সুন্দরী সবিতার ব্যক্তিত্বও ছিল আকর্ষণীয়। একটি বস্তিতে সমীক্ষা করতে গিয়ে ওর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়। ওর জীবন কাহিনী শোনাতে প্রথমে ওর আপত্তি ছিল, শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে যায়। ওর কাছ থেকে শোনা ওর দীর্ঘ জীবন কাহিনী আমার কাছে বড় রোমাঞ্চকর মনে হয়েছিল। বর্তমানে সবিতা তিনটি বাড়িতে রান্নার কাজ করে এবং বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল বিক্রি করে মাসে ২৫০০ টাকা রোজগার করে। একটিই ছেলে তার, সে রং-মিস্ত্রির কাজ করে। সবিতার সিঁথিতে সিঁদুর দেখে বুঝেছিলাম যে ওর স্বামী বেঁচে আছে কিন্তু স্বামী কোথায় জানতে চাইলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জানায় যে দীর্ঘদিন স্বামীর কোন খোঁজ নেই। তবে ওর ধারণা স্বামী বেঁচেই আছে কারণ মারা গেলেও ঠিকই খবর পেত।

সবিতা নবম শ্রেমঈতে পড়তে পড়তেই একটি ছেলের প্রেমে পড়ে। ছেলেটি সুপুরুষ এবং মানুষও নাকি ভাল ছিল। লেখাপড়ায় মন না থাকলেও সবিতার গানের গলা ছিল সুন্দর। ওর গান শুনে ওর প্রেমিক ওকে একজনের কাছে গান শেখাতে নিয়ে যায়। সেই সঙ্গীত শিক্ষকের একটি ছোট্ট স্কুল ছিল যেখানে নাচ-গান শেখানো হত। অল্পদিনের মধ্যেই সবিতা ওর দেহসৌষ্ঠব ও কণ্ঠস্ব দিয়ে সকলের মন জয় করে। ছোটখাটো অনুষ্ঠানে ওকে দিয়ে গান গাওয়ানো হত, নাটকেও সে অংশ নিত। শিক্ষকটি ওকে যখন ব্যবহার করে টাকা রোজগার করতে শুরু করেন, তখনই সবিদার পেমিক প্রমাদ গোনে।

সবিতার বাবা -মা মারা যাবার পর দাদা - বৌদির সংসারে সবিতাকে যথেষ্ট নির্যাতন সহ্য করতে হত। একদিন সবিতা

কাউকে কিছু না বলে ছেলেটির সঙ্গে পালিয়ে যায়। ছেলেটি ওকে নিয়ে প্রথমে একটি বস্তি বাড়িতে ওঠে। একমাস সেখানে থাকার পর দু'জনে কালিঘাটে গিয়ে মালাবদল করে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে ছেলেটি সবিতাকে নিয়ে এক অভিজাত অঞ্চলে নতুন একটি ফ্ল্যাটে উঠে যায়। সবিতা জানতো যে ওর স্বামী কোন একটি ব্যবসার কাজে যুক্ত। এই নতুন ফ্ল্যাটে উঠে এসে জানতে পারল যে ওর স্বামী ব্যবসায়ে উন্নতি করার ফলে ব্যবসার মালিক খুশি হয়ে ঐ ফ্ল্যাট ভাড়া করে দিয়েছে। মালিক বলেছেন যে সবিতাকেও ওর স্বামীর সঙ্গে চায়ের নিমন্ত্রণে ডাকবেন। ঐ ফ্ল্যাটে সুন্দর করে সাজানোর জন্য মালিক বেশ অর্থ ব্যয়ও করেছেন। একদিন সবিতার স্বামী দামী গাড়ি ও কিছু ইমিটেশন গয়না কিনে নিয়ে এসে সেগুলো পরিয়ে ওকে মালিকের বাড়ি নিয়ে যায় ডিনারের নিমন্ত্রণে। অবাক বিস্ময়ে সবিতা দেখে বিশাল বাড়ি সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে কিছু ঝকঝকে দম্পতির সমাগম হয়েচে, পানীয়ের এলাহি ব্যবস্থা। এককোনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। একসময় স্বামী ও মালিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। মালিকের চেহারা ও কথাবার্তা শুনে তাকে অবাঙালি বলেই মনে হয় সবিতার। তাঁর দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল যাতে সবিতা অস্বস্তি বোধ করে। সে বাড়ি ফিরে যেতে চায়। মালিক ও স্বামীর ঐ রাতটা তাঁর বাড়িতে থেকে যেতে বলেন। সেই রাতে সবিতাকে সরবতের সঙ্গে কিছু একটা মিশিয়ে খাওয়ানো হল। পরের দিন ভোরবেলায় নিজেদের ফ্ল্যাটে তার সম্বিত ফেরে। সবিতা কিছুতেই মনে করতে পারে না যে সেই রাতে কি ঘটেছিল। স্বামীর কাছ থেকেও সে কিছু জানতে পারে নি। পরে দু-তিনটি স্বর্ণ ও রত্নালঙ্কার এবং দামী কিছু শাড়ী ও প্রসাধন দ্রব্য দেখতে পায় এবং স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে যে মালিক ওদের বিয়েতে কিছু দিতে পারেননি বলে সেই রাতে এগুলি উপহার হিসেবে দিয়েছেন। তারপর থেকে ওদের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হতে থাকে। টেলিভিশন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিতে ঘর ভরে যায়, বাড়িতে একজন সবসময়ের কাজের মেয়ে ও দারোয়ান মোতায়ন করা হয়। সবিতার স্বামী মাঝে মাঝে ব্যবসার কাজে ৪/৫ দিন বাইরে থাকে, ফিরে এসে মাঝে মাঝেই সবিতাকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে যায় বিভিন্ন পার্টি ও নাইট ক্লাবে। কিন্তু মালিকের কড়া নির্দেশ ছিল সবিতাকে অন্য কোনো পুরষের ঘনিষ্ট হতে না দেবার। মাঝে মাঝে মালিকের সঙ্গে ওরা স্বামী-স্ত্রী গাড়ি করে বিভিন্ন জায়গায় বেনাতে যেত। সবিতার সামনেও ব্যবসা - সংক্রান্ত কথাবার্তা হত কিন্তু সবিতা তার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারত না। কিছুদিন পর সবিতর একটি পুত্রসন্তান জন্মায়। এরপরই একদিন ওর স্বামীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। কয়েকদিন বাদেই সে ছাড়া পেয়ে সবিতাকে জানাল যে, ভুল করে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, ভুল বুঝতে পেরে পরে তাকে আবার ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু এরপর থেকেই ওর স্বামী মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যেত, বেশ কিছুদিন ঘরেই ফিরত না। সবিতারও মনে হত স্বামী যেন কেমন ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু কিছুই তার কাছে স্পষ্ট হয় না। ছেলের বয়স যখন ৭/৮ বছর তখন একদিন বাইরের সোরগোলে রাতে ঘুম ভেঙে যায়। সবিতার স্বামী সন্ত্রস্ত হয়ে বাড়ির পেছনের পাঁচিলের দিকে ছুটে গিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। দরজায় ঘন ঘন করাঘাত শুনে সবিতা দরজা খুলে দেখে পাড়ারই কিছু মস্তান ধরনের ছেলে আর পুলিশ দাঁড়িয়ে। ছেলেগুলো ওর স্বামীর খোঁজ করে না পেয়ে বাড়িতে ঢুকে তোলপাড় করে, সবিতাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে। আলমারি খুলে দামী গয়না ও নগদ টাকা পয়সা নিয়ে নেয়। পুলিশ থেকে সবিতাঁকে বাড়ি ছেড়ে দিতে বলা হয়। সবিতা দু-তিন দিন সময় চেয়ে নেয়। তারপর ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে পড়ে আস্তানার খোঁজে। রাস্তায় কিছুটা দূরে দুটি ছেলে অপেক্ষা করছিল— তাদের একজনকে স্বামীর বন্ধু বলে চিনতে পারল সবিতা। ওরা জানাল যে, সবিতার স্বামীর নির্দেশেই ওরা সবিতাকে সাহায্য করতে এসেছে। সবিতা ও ছেলেকে রিকশায় তুলে নিয়ে এল এক বস্তিতে। [এই সেই বস্তি যেখানে সবিতার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। সবিতার আপত্তি থাকায় তার বস্তি সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ করতে পারলাম না।] বেশ কিছু টাকা ওর স্বামী বন্ধুদের মাধ্যমে সবিতাকে পাঠিয়েছিল, তা দিয়ে সবিতা কদিন চালাল। তারপর স্বামীর আর তার চাক্ষুষ দেখা হয়নি—মাঝে মাঝে বন্ধুদের মাধ্যমে স্বামীর খবর পেয়েছে, মাঝে মাঝে স্বামীও তাকে বন্ধুদের মাধ্যমেই টাকা পাঠিয়েছে। তবে গত দশ বছরের মধ্যে তার আর কোনো খোঁজ মেলেনি, বন্ধুরাও আর আসে না। এখনও সবিতা শাঁখা - সিঁদুর পরে, অপেক্ষা করে স্বামীর জন্য। তার বয়স হয়ে গেছে, অত্যধিক পরিশ্রম করতে পারে না। তার ছেলে রাজস্থানের কোন এক অঞ্চলে নির্মাণ কার্যে যুক্ত আছে। সবিতা একাই থাকে এখানে। আশায় বুক বেঁধে থাকে বেঁচে থাকলে স্বামী একদিন ফিরে আসবে।

এদের জীবনকাহিনী থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে গৃহপরিচারিকা হিসাবে কাজে যোগ দেবার সময় এদের অধিকাংশই ছিল নাবালিকা। কেউ কাজের বাড়িতে সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশ পেয়েছে, কারোর বা সেই সৌভাগ্যও হয়নি। কারোর মনিব সহানুভূতিশীল, কারোর মনিব আবার রক্ষকের ছদ্মবেশে ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। মূলতঃ অভাবের তাড়নায় এরা এই কাজে নিযুক্ত হয়েছে। কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের সাম্প্রতিক নির্দেশ অনুযায়ী ১০ অক্টোবর থেকে চোদ্দ বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়েদের বাড়ির কাজে লোক বা পরিচারক হিসাবে নিয়োগ করা যাবে না এমনকি ধাবা, রেস্তোরা, হোটেল, মোটেল, চায়ের দোকান, রিসর্ট বা কোনাও ধরনের আমোদ - প্রমোদের জায়গাতেও কাজে লাগানো যাবে না। এর অন্যথা হলে নিয়োগকারীকে জেল জরিমানার মত শাস্তির কোপে পড়তে হবে। বলাই বাহুল্য এই আইনের কার্যকারিতার প্রসঙ্গের পাশাপাশি শিশু ও নাবালক - নাবালিকা শ্রমিকদের পুনর্বাসনের প্রসঙ্গটিও অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। সর্বগ্রাসী দারিদ্র্য যখন কোন পরিবারকে বিপর্যস্ত করে দেয়, তখন শুধু দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন সংস্থানের জন্য পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে জীবন সংগ্রামের সামিল হতে হয়, স্বাভাবিকভাবে শিশুরাও এই সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে। উপার্জন করে সংসার চালানোর দায়িত্ব এসে পড়ে তাদের ছোট্ট কাঁধে। তারা শৈশব হারায়, সারল্য হারায়, হারিয়ে ফেলে জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী। তাই আইন করে তাদের কাজে যোগ দেওয়া হয়তো প্রকাশ্যে বন্ধ করা যাবে কিন্তু আইনের ফাঁক ধরে এই নিয়োগ গোপনে চলতেই থাকবে যত দিন না তাদের দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান নিশ্চিত হচ্ছে। এই সংস্থান নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকার ও প্রশাসনের, বিভিন্ন সংগঠনের এবং সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি ব্যক্তির। এ আমাদের প্রত্যেকের সামাজিক দায়বদ্ধতা। শিশুর অন্ন ও বস্ত্রের অধিকার, শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের অধিকার এবং সুস্থ পরিবেশে বেঁচে থাকার অধিকার সুনিশ্চিত হলে শিশুশ্রম স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হয়ে যাবে, এর জন্য কোন আইনের প্রয়োজন হবে না।

বিঃ দ্রঃ— গৃহপরিচারিকাদের একটি বৃহৎ অংশ স্বামী-পরিত্যক্ত। এই অংশের পরিসংখ্যাগত নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এদের নিয়ে পৃথকভাবে একটি গবেষণা হওয়া প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। কারণ এদের জীবনযাপন ও সন্তান পালনের সমস্যা এবং সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি অন্যান্যদের চেয়ে কিছুটা হলেও বেশি সমস্যাজর্জর।